সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, **সুজন**-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৮ নভেম্বর, ২০০৭)

সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা আজ একটি সার্বজনীন আকাঙ্ক্ষা। এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে অনেকগুলো ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন, যার মধ্যে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা অন্যতম। ভোটারদের তথ্য দেয়ার উদ্দেশ্য হলো তাদের ক্ষমতায়িত করা। আর নির্বাচনের আগে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা হলেই ভোটাররা ক্ষমতায়িত হবেন এবং জেনে-শুনে-বুঝে ভোট দিয়ে সৎ, দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচনে সক্ষম হবেন। সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ২০০৫ সালে একটি যুগান্তকারী রায়ে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করে। অনেকগুলো নাটকীয় ঘটনার পর মামলাটি এখন আপিল বিভাগে বিচারাধীন রয়েছে। সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বর্তমানে আমরা কী অবস্থায় আছি তা পর্যালোচনা করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

উল্লেখ্য যে, মামলাটির পক্ষ হওয়ার জন্য 'সুজন'-এর দিক থেকে অতীতে নির্বাচন কমিশনকে একাধিকবার অনুরোধ করেও কোনো ফল পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন মামলাটির নিষ্পত্তির ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। দেরিতে হলেও কমিশনের এ উদ্যোগ গ্রহণে আমরা আনন্দিত।

হাইকোর্টের রায় ও পরবর্তী ঘটনা

গত ২৪ মে ২০০৫, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্ত ও বিভিন্ন তথ্যাবলী জনসমক্ষে প্রকাশের পক্ষে রায় (***আব্দুল মোমেন চৌধুরী এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ***) দেন। এতে নির্বাচন কমিশনকে প্রত্যেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের সাথে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী হলফনামার আকারে সংগ্রহ করার এবং এগুলো গণমাধ্যমকে দিয়ে জনগণের মাঝে প্রচার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়: (ক) সার্টিফিকেটসহ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা; (খ) বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগের তালিকা (যদি থাকে); (গ) অতীত ফৌজদারী মামলার তালিকা ও ফলাফল; (ঘ) প্রার্থীর পেশা; (ঙ) প্রার্থীর আয়ের উৎস এবং উৎসসমূহ ; (চ) অতীতে সংসদ সদস্য হলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকার বর্ণনা; (ছ) প্রার্থী ও প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের সম্পদ এবং দায়-দেনার বর্ণনা; এবং (জ) ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগতভাবে বা যৌথভাবে এবং কোম্পানী কর্তৃক – যে কোম্পানীতে প্রার্থী চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক কিংবা পরিচালক – গৃহীত ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা।

হাইকোর্টের এই রায় বাস্তবায়নে জনাব এম এ আজিজের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ ছিল দায়সারা ও লোক দেখানো। ফলে বিগত সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচন ও নারীদের সংরক্ষিত আসনের নির্বচনে প্রার্থীদের দাখিলকৃত হলফনামাও ছিল শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার প্রচেষ্টা। উপরন্তু, 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে লিখিতভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন কিংবা সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছ থেকে হলফনামার কপি পাওয়া যায় নি, যদিও জনমতের চাপে পরবর্তীতে এগুলোর একটি সারাংশ প্রকাশ করা হয়। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ওই হলফনামাগুলো অসত্য, অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর তথ্যে ভরপুর। যেমন কোন কোন প্রার্থী শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে 'প্রযোজ্য নয়' লিখেছেন।

উল্লেখ্য যে, রায়টি ঘোষণার পর এটিকে পরবর্তী পাঁচটি উপ-নির্বাচনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত সারাংশের ভিত্তিতে লিফলেট তৈরি করে ভোটারদের কাছে বিতরণ করি। একইসাথে আমরা প্রার্থী ও ভোটরদের তিনটি উপনির্বাচনে মুখোমুখি করার উদ্যোগ নেই। এ সকল উদ্যোগগুলো ছিল অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক। সর্বোপরি এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারের পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়।

স্মরণ করা প্রয়োজন যে, নির্বাচন কমিশনের লোক দেখানো প্রচেষ্টা ছাড়াও, নির্বাচনে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় হাইকোর্টের রায়কে ভণ্ডুল করার জন্য একদল স্বার্থান্বেষী প্রায় শুরু থেকেই অনেক অনিয়ম এমনকি জালিয়াতিমূলক পদক্ষেপের আশ্রয় গ্রহণ করে। উপরিউক্ত রায়ের বিরুদ্ধে জুলাই ২০০৫ সালে জনৈক মোঃ আবু সাফা সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থে একটি আপিলের আর্জিও পেশ করেন এবং তখন থেকেই শুরু হয় অনিয়ম। জনাব সাফা'র আর্জির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের সচিবালয় আপত্তি তোলে, কারণ তিনি ছিলেন তৃতীয় পক্ষ এবং মূল মামলার সাথে তার কোনোরূপ সম্পৃক্ততা ছিল না। কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য কারণে প্রচলিত রীতি ও পদ্ধতি উপেক্ষা করে জনাব সাফা'কে আপিল দায়েরের অনুমতি দেয়া হয়।

পরের জালিয়াতির ঘটনাটি ঘটে আপিল গ্রহণের পর্যায়ে। আপিল আবেদনের শুনানির নোটিশ নির্বাচন কমিশনকে দেয়া হয় নি, যদিও নির্বাচন কমিশন ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন মূল মামলার বিবাদী। এ ছাড়া মামলার মূলবাদী, তিন আইনজীবির নোটিশেও শুধু তাঁদের নাম এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এই ঠিকানা লিখে প্রেরণ করা হয়। সংগত কারণেই নোটিশটি তাঁদের ঠিকানায় পৌঁছে নি। ফলে প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেন, বিচারপতি জনাব এমএম রুহুল আমিন ও বিচারপতি জনাব আমিরুল কবীর চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত আপিল বিভাগের একটি বেঞ্চে একতরফা শুনানির মাধ্যমে আপিলটি গৃহীত হয়, যদিও আদালত হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ দেন নি। দুর্ভাগ্যবশত অতি জনগুরুত্বপূর্ণ মামলা হওয়া সত্ত্বেও আদালত বাদীদের অনুপস্থিতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন নি।

এর পরের ঘটনাটি আরও গুরুতর। আপিল দায়ের করার পর মামলার মূল বাদীগণ আদালতে কেভিয়েট দায়ের করে আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে মামলার শুনানির অপেক্ষায় থাকেন। কেভিয়েট দেয়া থাকলে আইনসম্মত পদ্ধতি হলো, শুনানির সময় সংশ্লিষ্ট পক্ষের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং তাঁদের বক্তব্য শোনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আদালত শীতকালীন অবকাশে যাওয়ার চার দিনের মাথায় গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০০৬ তারিখে – ২২ জানুয়ারি, ২০০৭ অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের মাত্র একদিন আগে – জনাব সাফা'র আইনজীবিগণ অবসরকালীন বেঞ্চের চেম্বার জজ বিচারপতি জনাব জয়নাল আবেদীনের শরণাপন্ন হন এবং বাদীদের অনুপস্থিতিতে হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ নেন। স্থগিতাদেশের আর্জিতে জনাব সাফা দাবি করেন, তিনি স্বল্প শিক্ষিত, তাই হলফনামায় তার শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশ করা হলে তা হবে তার জন্য বৈষম্যমূলক।

এ ক্ষেত্রে জালিয়াতির ঘটনাটি হলো, স্থগিতাদেশের প্রার্থনায় জনাব সাফা দাবি করেন, তিনি আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়নপত্র ক্রয় করেছেন। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জনাব সাফা তাঁর নির্বাচনী এলাকা চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কোনো মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন নি কিংবা জমা দেন নি; এমনকি বিদ্যমান ভোটার তালিকায়ও তাঁর নাম নেই। তিনি দাবি করেন, দারিদ্র্যের কারণে তিনি শুধু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ পান, তবে তিনি স্বশিক্ষিত হলেও বিত্তশালী এবং সন্দ্বীপের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। তিনি আরও দাবি করেন, তিনি অতি জনপ্রিয় ও নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদ এবং আগামী সংসদ নির্বাচনে একজন সম্ভাব্য প্রার্থী।

এসব তথ্যই ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ, সন্দ্বীপে গিয়ে এবং বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া যায় নি। সেখানে তাঁর বাস্তভিটা পর্যন্ত নেই। তবে স্থানীয় অনেকের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, তিনি একজন পাকিস্তান ফেরত সাবেক সৈনিক এবং তিনি সন্দ্বীপে থাকেন না ও গত ছয় বছরেও তিনি সেখানে যান নি। অনেকের দাবি, জনাব সাফা একজন দুর্বৃত্ত। প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই তিনি একাধিক বিয়ে করেছেন এবং সম্ভবত তিনি ঢাকায় নৈশপ্রহরীর কাজে নিয়োজিত আছেন। তাঁর সম্পর্কে প্রথম আলো'র একটি তদন্ত প্রতিবেদনের শিরোণাম ছিল, 'সুপ্রিম কোর্টে আবু সাফার আবেদন: সন্দ্বীপে তাঁর স্বজনেরা হেসেই খুন'। (২৪ ডিসেম্বর, ২০০৬)

সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ জে আর মোদাচ্ছির হোসেনের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের বিচারপতি জনাব ফজলুল করিম, বিচারপতি জনাব এমএম রুহুল আমিন ও বিচারপতি জনাব আমিরুল কবীর চৌধুরীকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চে এ আপিলের শুনাননিকালে পরবর্তীতে একটি দুঃখজনক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। শুনানিকালে মূল বাদীদের কৌসুলি ড. কামাল হোসেন জালিয়াতির কারণে আপিল আবেদনটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রবল আপত্তি উত্থাপন করেন। ড. কামাল হোসেন দাবি করেন, জনাব সাফা কোনো স্বার্থান্বেষী মহল দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছেন এবং তিনি একজন প্রতারক এবং বিজ্ঞ কৌসুলি তাঁর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট জালিয়াতির অভিযোগ আনেন। ড. কামাল হোসেন দাবি করেন যে, *ড. মহিউদ্দিন ফারুক বনাম বাংলাদেশ* [১৭ বিএলডি (এডি)১৯৭৭] মামলার রায় অনুযায়ী, প্রতারকদের জনস্বার্থ মামলা করার কোনো এখতিয়ার নেই। উল্লেখ্য যে, জনাব সাফার প্রতারণার বিষয়টি টের পেয়ে তাঁর পক্ষের সিনিয়র আইনজীবিরা একের পর এক এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান। এ অবস্থায় তাঁর কনিষ্ঠ আইনজীবি মামলাটি পরিচালনা করেন।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি আদালত মামলাটির রায় ঘোষণা করেন এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আবু সাফার আপিলটি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ব্যপকভাবে জনপ্রিয় এবং গত পাঁচটি উপনির্বাচনে বাস্তবায়িত হাইকোর্টের রায়টি খারিজ করে দেন, যদিও জনাব সাফার আইনজীবির আপত্তি ছিল শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রকাশের ক্ষেত্রে। পরে অবশ্য ড. কামাল হোসেনের গুরুতর আপত্তির মুখে আদালত তাঁর রায় ওই দিনই নাটকীয়ভাবে প্রত্যাহার করেন। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন নাটকীয়তা আদালতের প্রতি জনগণের আস্থা মারাত্মকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

ভোটারদের তথ্যের অধিকার সংরক্ষণে করণীয়

মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তি

জনাব আবু সাফার দায়েরকৃত আপিল মামলাটি নিষ্পত্তির বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের গৃহীত উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। কারণ মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তি করে হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের তথ্যের অধিকার সংরক্ষণ জরুরি।

উল্লেখ্য যে, মামলাটি বিচারাধীন এবং হাইকোর্টের রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ থাকা সত্ত্বেও, জনদাবির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন তার প্রস্তাবিত *গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ-২০০৭*-এ হাইকোর্ট নির্দেশিত ৮টি তথ্য প্রার্থী কর্তৃক একটি 'ঘোষণাপত্র' আকারে প্রদান করার বিধান করেছে। কমিশনের এই প্রস্তাব প্রশংসনীয়। কিন্তু হাইকোর্টের নির্দেশানুযায়ী তথ্যগুলো 'হলফনামা' আকারে দেওয়ার কথা, ঘোষণাপত্র হিসেবে নয়। তাই আমরা প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে ঘোষণাপত্রের পরিবর্তে হলফনামা সংযুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

বিচারপতি আজিজের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন হলফনামার যে ছকটি তৈরি করেছেন তাও সন্তোষজনক নয়। জনগণের তথ্যের অধিকার পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে হাইকোর্ট নির্দেশিত ৮টি তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ হলফনামায় উল্লেখ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হলফনামার ছকে উল্লেখিত 'আয়ের উৎস'-তে কৃষি বা ব্যবসা বা অন্য কোনো পেশা উল্লেখ করাই যথেষ্ট নয়; প্রার্থী যদি ব্যবসায়ী হন তাহলে তাঁর ব্যবসায়ের ধরণ, মূলধনের পরিমাণ ও উৎস, বাৎসরিক আয়-ব্যায় মুনাফা এবং এ সম্পর্কিত সকল তথ্যের বিশদ বিবরণ থাকা প্রয়োজন। এভাবে নির্দেশিত ৮টি তথ্যেরই যথাযথ বিবরণ হলফনামাতে দেওয়া থাকলে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হবে।

নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের একটি অসঙ্গতি রয়েছে; [ধারা ১৪(১)(গ)]-এর অধীনে আট ধরনের তথ্য সম্বলিত ঘোষণাপত্র পেশ করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। একইসাথে প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের ধারা ৫০-এর অধীনে "মনোনয়নপত্রের সহিত নির্বাচনের সম্ভাব্য খরচের উৎসের বিবরণী পেশ" এই শিরোণামে নির্ধরিত ফরমে প্রার্থীর সম্পদ ও দায়, তার বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী, আয়কর রিটার্নের কপিসহ প্রার্থীতা প্রত্যাহারের অব্যবহিত পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে দাখিল করার বিধান করা হয়েছে [ধারা ৫০(২)]। (নিঃসন্দেহে এটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল – শিরোণামে মনোনয়নপত্রের সাথে বিররণী জমা দেওয়ার কথা বলা হলেও, এর অভ্যন্তরে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সাত দিনের মধ্যে এগুলো জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।) আমরা মনে করি যে, শেষোক্ত তথ্যগুলিও মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা আকারে পেশের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। একইসাথে হাইকোর্টের নির্দেশানুযায়ী, হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যগুলোর সারাংশ গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে প্রকাশ করাও জরুরি।

জনগণের কাছে সময়মতো তথ্য সরবরাহ

ভোটারদের ক্ষমতায়নের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় তথ্য দিলেই চলবে না, তথ্য সময়মতো প্রকাশ করতে হবে, যাতে এগুলো ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে পারে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী, প্রার্থীরা মনোনয়নপত্রের সঙ্গে তথ্য জমা দেবেন। ফলে প্রার্থীদের পক্ষে সব তথ্য বিবরণী জমা দেয়ার পর এগুলো ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর জন্য মাত্র সপ্তাহ তিনেক সময় থাকবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন যদি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য সপ্তাহ খানেক সময় নেয় তাহলে বাকী দুই সপ্তাহের মধ্যে এগুলো ডাউনলোড করে বোধগম্য আকারে (যেমন, লিফলেট আকারে) ভোটারদের কাছে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। ফলে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ভোটারদের ক্ষমতায়িত করার মহৎ উদ্দেশ্যই পুরোপুরি ভণ্ডুল হতে বাধ্য।

সময়মতো তথ্যপ্রাপ্তির সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার তিন দিনের মধ্যেই সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থীরা তাদের অংশগ্রহণ করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। তারা 'ইনটেন্ট টু রান' বা 'নির্বাচনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক' এই মর্মে একটি দরখাস্ত কমিশনের কাছে জমা দিবেন। দরখাস্তের সাথে তাদের জীবন বৃত্তান্ত, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের খতিয়ান (যদি থাকে) এবং তাঁদের ও তাঁদের ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণী আয়কর রিটার্নের কপি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য কমিশনে দাখিল করবেন। এসব বিবরণীর হার্ড কপির সঙ্গে সফ্‌ট কপিও তাঁরা জমা দেবেন। হার্ড কপি কমিশন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গিয়ে দেবে এবং সফ্‌ট কপি দ্রুততার সাথে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। তবে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের পর শুধু চূড়ান্ত প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য ও বিবরণীগুলো কমিশন নিরীক্ষা করবে।

আগেভাগে তথ্য প্রকাশ করার কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি রয়েছে। প্রথমত, আগে তথ্য পেলে এগুলো অবশ্যই সময়মতো ভোটারদের কাছে পৌঁছানো যাবে। দ্বিতীয়ত, প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য চ্যালেঞ্জ করে অন্যদের পক্ষে 'কাউন্টার এফিডেভিট' বা 'বিরোধী হলফনামা' জমা দেওয়া সম্ভব হবে, যার ফলে রিটার্নিং অফিসারগণ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য যথাযথভাবে যাচাই করতে পারবেন। বিরোধী হলফনামা পেশের বিধান অবশ্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে সংযুক্ত বরতে হবে। উল্লেখ্য যে, এমন বিধান ভারতীয় আইনে বিদ্যমান। তৃতীয়ত, আগে থেকে তথ্য পেলে গণমাধ্যমের পক্ষে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব।

সময়মতো তথ্য প্রকাশের, বিশেষত গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে যে গুরুতর প্রভাব পড়ে, তার জলন্ত উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে ফরিদপুর-১ আসনের উপনির্বাচনে কাজী সিরাজুল ইসলামকে চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে (যিনি আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপি'তে যোগ দান করেন) মনোনয়ন প্রদান করা হয়। মনোনয়ন ঘোষণার পর দৈনিক *প্রথম আলো*'র ৯ আগস্ট ২০০৫ তারিখের সংখ্যায় 'ফরিদপুর-১ উপনির্বাচন: তথ্য গোপন করেছেন বিএনপি প্রার্থী কাজী সিরাজ' শিরোণামে প্রথম পৃষ্ঠায় একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় হাইকোর্টে নির্দেশিত প্রার্থীদের আট দফা তথ্যের হলফনামায় তিনি ঢাকায় মিরপুর থানায় তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার কথা উল্লেখ করেন নি। পরের ঘটনা ইতিহাসের অংশ: চারদলীয় জোট কাজী সিরাজের মনোনয়ন বাতিল করে অপর প্রার্থী শাহ্ মো: জাফরকে মনোনয়ন প্রদান করেন। তাই আমরা আশা করি যে, নির্বাচন কমিশন গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের প্রস্তাবটি বিবেচনা করবেন।

এছাড়াও হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যগুলো গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে প্রচার করা বাধ্যতামূলক। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে কিছুই বলা নেই। আমরা আশা করি যে, কমিশন এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য ও নিরীক্ষা

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাচাই-বাছাই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন অবশ্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে ৫৬(২) ধারায় প্রার্থীর দাখিলকৃত বিবরণীতে ভুল তথ্য পরিবেশন বা তথ্য গোপন করার ঘটনা উদঘাটিত হলে নির্বাচন বাতিলের বিধান করেছে। তবে, তথ্য নিরীক্ষা সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। আমরা মনে করি যে, কমিশনকে দাখিল করা সকল প্রার্থীদের সব তথ্য পদ্ধতিগতভাবে মূল্যায়ন করে ভুল তথ্য প্রদানকারী ও তথ্য গোপনকারীদের নির্বাচন বাতিল করতে হবে, যাতে কোনো অস্বচ্ছ ও অসাধু ব্যক্তি শাস্তি এড়াতে না পারে। এছাড়াও প্রার্থীরা যদি জানেন যে, তাঁদের প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হবে তাহলে তাঁরা ভুল বা অসত্য তথ্য দেয়া থেকে বিরত থাকবেন এবং অনেক অবাঞ্ছিত প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। এতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আসবে।

ভোটারদেরকে তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করার ক্ষেত্রে শুধু নির্বাচন কমিশনই নয়, রাজনৈতিক দলগুলোরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রার্থীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আগেই সংগ্রহ করবে এবং নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করবে। একইসঙ্গে প্রকাশ করবে তাদের মনোনয়ন দেয়ার সুস্পষ্ট মানদণ্ড এবং মানদণ্ডের আলোকে প্রার্থীদের অবস্থান। এতে দলগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

উপসংহার

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের মতে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার ভোটারদের বাক স্বাধীনতার অর্থাৎ মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর বিভিন্ন প্রদেশে 'ইলেকশন ওয়াচ' নামে নাগরিক উদ্যোগ গড়ে উঠে। এ সকল উদ্যোগ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের প্রচেষ্টার ফসল। এ সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান প্রাদেশিক ও জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্য জনগণের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একইসাথে তারা আরো তথ্যপ্রাপ্তির এবং অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পক্ষে সোচ্চার হন এবং জনমত সৃষ্টি করেন। ভারতীয় গণমাধ্যম 'ইলেকশন ওয়াচে'র সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। নির্বাচন কমিশনও তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। ফলে ভারতীয় নির্বাচনী পদ্ধতিকে আরো স্বচ্ছ এবং সৎ ও স্বচ্ছ ব্যক্তিদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছে। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত পোক্ত করতে হলে আমাদেরকেও এমন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। কারণ তথ্য হলো গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি।

অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে নির্বাচন কমিশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে। আর তা হলো ২২ জানুয়ারির বাতিল হওয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীদের দাখিলকৃত তথ্য প্রকাশ করা। উল্লেখ্য যে, এসকল তথ্য পাওয়ার লক্ষ্যে 'সুজন'-এর পক্ষ থেকে বিধিগতভাবে যথাসময়ে কোর্ট ফি দিয়ে দরখাস্ত করেও আমরা অধিকাংশ রিটার্নিং অফিসারদের কাছ থেকে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া এসব তথ্য পাই নি। এসব তথ্য পাবলিক ইনফরমেশন – নির্বাচন কমিশন আইনগতভাবে এসব তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য – তা জেনেই প্রার্থীরা এগুলো জমা দিয়েছেন। তাই এগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। আমরা মনে করি, এসব তথ্য প্রকাশ জনস্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।